বিশ^বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা জরুরি

শান্তনু চৌধুরী

২০ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২০ নভেম্বর ২০১৯ ০০:৪৬

প্রতিটি পড়ুয়া শিক্ষার্থীর মনে স্বপ্ন থাকে একদিন সে বিশ^বিদ্যালয়ে পড়বে। সেই স্বপ্ন সে লালন করে আশপাশের বড় ভাই, বোনদের বা সফল মানুষদের দেখে। এর পর পরিবারের স্বপ্ন, বিশেষ করে যারা মফস্বলে থাকেন, শহরতলিতে থাকেন।

advertisement

সন্তানও বাবা-মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার পর থেকে শুরু করে আক্ষরিক অর্থে ‘কোমর বেঁধে’ পড়াশোনা। এখানে-সেখানে কোচিং করা, শিক্ষকদের কাছে বা পরিচিত কেউ বিশ^বিদ্যালয়ে থাকলে তার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া। এমন করতে করতে দিন আসে ভর্তি পরীক্ষার। আমাদের দেশে যেহেতু সম্মিলিত ভর্তি পরীক্ষা নেই, সে কারণে জান জেরবার করে ট্রেনে-বাসে ছুটে আজ এই বিশ^বিদ্যালয়ে তো কাল অন্য বিভাগে বা অন্য জেলায় আরেক বিশ^বিদ্যালয়ে পড়িমড়ি করে ছুটে চলা, ভর্তি পরীক্ষায় বসা। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া, অনেক সময় বুঝে না বুঝে মুখস্থ করা। সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকেরও ছোটাছুটি। সেই প্রথম ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময়ই একজন শিক্ষার্থী পরিচিত হয়ে যায় বিশ^বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে। নতুন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে মিছিল বের করা হয়। এখন যেহেতু একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগই সক্রিয় সে কারণে তারাই মিছিল বের করে। আগে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন পাল্টাপাল্টি মিছিল বের করত, এর কারণে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমনকি ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে লাশ হয়ে ফিরে গেছে এমন নজিরও রয়েছে। এর পর কোনোমতে বিশ^বিদ্যালয়ে টিকে গেলেই বুঝি স্বপ্ন সত্য! আহা!

কিন্তু না! অন্য দেশে হলে বা এখন থেকে দু’দশক আগে হলেও আমাদের দেশে সেটা সত্য ছিল। কিন্তু এখন বিশ^বিদ্যালয়ে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কারণ হলো সিট পাওয়া, থাকা, খাওয়া যে অনেক কষ্টের সেটা যারা দেখেননি তাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল। শ্রমিক হিসেবে যারা বিদেশে যান গ্রামে যেমন মনে করা হয় তারা বেশ সুখে আছেন, বাস্তবে থাকেন অনেক কষ্টে, তেমনি বিশ^বিদ্যালয়ের গণরুমের কথা মনে হলেই আঁতকে উঠতে হয়। এতসব কষ্ট সহ্য করে বিশ^বিদ্যালয়ে পড়া এ কারণে যে, বিশ^বিদ্যালয় মানে বিশাল বিদ্যালয়, সেখানে কূপম-ূকতা থাকবে না, সবকিছু দেখা হবে বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে। মনকে উদার করবে সে জ্ঞানপাঠ। কিন্তু সেসব যেন এখন অতীতের রূপকথা। প্রায় প্রতিটি বিশ^বিদ্যালয়ে এখন চলে খুনোখুনি, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের জ¦ো□লায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা অতিষ্ঠ। আবরার হত্যার মধ্য দিয়ে এমন বার্তাও এসেছে যে, নিছক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য, মতের মিল না হলেও একজনকে মেরে ফেলা যায়। ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতারা এখন টাকার পেছনে ছুটছে, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি বড় ব্যবসা। বৃহৎ জ্ঞানের আধার হিসেবে যেটির নাম বিশ^বিদ্যালয় সেখানে এখন অশান্তির বারুদ। পাবলিক বিশ^বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকে সন্তানকে পড়ান প্রাইভেট বিশ^বিদ্যালয়ে কিন্তু সেখানেও কি শুভ বারতা আছে? নেই। কারণ বহুল ব্যবহৃত উদাহরণ হিসেবে যদি বলি, ‘ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বিশ^বিদ্যালয়’, কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বাসাবাড়িতে বিশ^বিদ্যালয়, এমনও রয়েছে নিচের তলায় স্টেশনারি দোকান, চায়ের দোকান ওপরে বিশ^বিদ্যালয়। সেখানে বিশাল অর্থে যে জ্ঞান তার কোনো চর্চা নেই। কেন এমন, কেন এখন বিশ^বিদ্যালয়গুলোতে অশান্তির বারুদ জ¦লে, এখন হানাহানি লেগে থাকে? কেন অসহনশীল হয়ে উঠছে শিক্ষার্থীরা। এর অন্যতম কারণ শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির যে পাঠ সেটা এখন বিশ^বিদ্যালয়ে নেই। যে বিশ^বিদ্যালয়গুলোতে এক সময় সাংস্কৃতিকচর্চা লেগে থাকত বছরজুড়ে সেখানে এখন কোনো আয়োজনই চোখে পড়ে না। হয়তো ছোট্ট পরিসরে হয় কিন্তু সেটা ব্যাপক অর্থে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এতে বিপথে যাওয়ার পাশাপাশি উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চা থেকে বঞ্চিত হন উচ্চশিক্ষা নিতে আশা শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ। তাদের মধ্যে সংস্কৃতির আবহ ঢুকতে না পেরে সেখান দিয়ে প্রবেশ করে নিষ্ঠুরতা, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদকের মতো বিষয়গুলো। যা শুধু নিজেকে ধ্বংস করে এমন নয়, সামগ্রিকভাবে পুরো দেশের জন্যই এটি বিপজ্জনক বার্তা নিয়ে আসে। ইউজিসির কাছে যখনই এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় তারা বলে ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো চাপ দেওয়া ছাড়া তাদের আসলে কোনো ক্ষমতা নেই। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে যখন এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রাখছে, সেখানে কিন্তু বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে তাদের মানসিক বিকাশের বিষয়টি। কারণ অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই পাঠ্যক্রমের বাইরে কোনো সাংস্কৃতিক কর্মকা-ের চর্চা নেই। বছরজুড়ে হয়তো দু-একটি জাতীয় দিবস পালন করা হয়। কিন্তু মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে এসবের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। এখন এমন হয়েছে, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

চৌধুরী বলতে বাধ্য হয়েছেন, ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে। দুই জায়গায় মাতৃভাষার চর্চা সেভাবে নেই। ইতিহাস পড়ানো হয় না। দেশীয় সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচরণের শিক্ষা দেওয়া হয় না। এ কারণে এখানকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়, আর বিচ্ছিন্নতা তো একটি রোগ। বিচ্ছিন্নতা থেকেই এই তরুণরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে, নয়তো জঙ্গি হয়।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এক সময় বিখ্যাত ছিল চায়ের আড্ডা, সাংস্কৃতিকচর্চা এবং বক্তৃতা-মিছিলের জন্য। কিন্তু এখন বস্তির মানুষের সঙ্গে বিশ^বিদ্যালয়গুলোর ভবনে থাকা শিক্ষিত মানুষের কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ শিক্ষিত মানুষের বস্তি। বস্তিতে যে সংস্কৃতি আছে, তা সেখানেও রয়েছে। হানাহানি, কলহ, ছিনতাই ও রাহাজানি হচ্ছে। ছাত্ররা নারী লাঞ্ছনা করছে, এমন খবরও শুনতে হচ্ছে। আবার ভিসি নিজের পদ টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের তোয়াজ করছে। প্রশাসন দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে, শিক্ষকরা মারামারিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আবার ছাত্ররা র‍্যাগিং বা আদব-কায়দা শেখানোর নামে ‘বস্তির ভাষায়’ অপমান করছে। তা হলে পার্থক্য কোথায়?

অনেক বিশ^বিদ্যালয় অজুহাত দিয়ে থাকে, অবকাঠামোগত সমস্যা, পড়াশোনার চাপের কারণে অনেক সময় নিয়মিত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বাজারমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীদের ক্লাসের বাইরে সময় কমে আসছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার অভাবে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ হচ্ছে না। তাই শিক্ষাকে মানসম্মত আর গঠনমূলক করতে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। পড়ালেখার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিকচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীদের মাদক সেবন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখে। এক মমত্বে গড়ে উঠলে নারীর প্রতি সহিংস আচরণও লোপ পায়। এখন মুঠোফোনের বদৌলতে যে ঘাড় গোঁজা জেনারেশন তৈরি হচ্ছে সেটি আগামী দিনগুলোর জন্য সুফল বয়ে আনবে না। একটা সময়ে দেশের বিশ^বিদ্যালয়গুলো কট্টরপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোর দখলে ছিল, আমরাও চাইতাম কখন উদারপন্থিরা আসবে। তারা এলো কিন্তু সময় পাল্টাতে সময় নিল না। বর্তমান ক্ষমতাসীনরা সংস্কৃতিচর্চার প্রতি উদার। কিন্তু সেই চর্চা আবারও শুরু করতে হবে আঁতুড়ঘর থেকে। নৈতিকতা শিক্ষা, দেশপ্রেম জাগ্রত করা, সচেতনতা তৈরি, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানা, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞান, সর্বত্র সাংস্কৃতিকচর্চা এবং বন্ধুদের সময় দেওয়ার অভ্যাসই পারে একটি বিশ^বিদ্যালয়কে সত্যিকার অর্থে বড় করে তুলতে। শুধু বই পড়ে বই হলে চলবে না। বিকশিত হয়ে উঠতে হলে, জীবনের রঙকে রাঙিয়ে তুলতে হলে প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিকাশ। বিশ^বিদ্যালয়ের সেই হারিয়ে যাওয়া সময়, সংস্কৃতির জাগরণ আর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পুনর্জাগরণ যত দ্রুত ঘটবে ততই সবার জন্য মঙ্গল।

শান্তনু চৌধুরী : সাংবাদিক ও সাহিত্যিক